

জিনেলের
ওপাবি

জীবনের ওপাৰে

ফারিহা মায়মুনা



IFFAH
PUBLICATIONS



উৎসর্গ

আমার প্রিয় কন্যা আরওয়া কে—
যার আগমনের প্রতীক্ষার দিনগুলোতেই
আমার কলমে জন্ম নিয়েছে বইয়ের প্রতিটি
বাক্যবিন্যাস।

এবং
আমার জীবনের অভিভাবক ও সহযাত্রী,
আমার সম্মানিত স্বামীকে..





সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা । ৯
লেখিকার কথা । ১১
সম্পাদকের কথা । ১৩
টানেলের ওপারে । ১৫
রুহের নিরাময় । ৩৯
আয়নাবাজি । ৫৩
হৃদয়ের মুক্তি । ৬৭
নোঙর । ৮৫
দাওয়াহের রাফখাতা । ৯৭
হারিয়ে যাওয়া ক্ষণ । ১১৫
অনুতাপের অনল । ১২৫
নতুন দিন নতুন আমি । ১৪৩





প্রকাশকের কথা

আমাদের সময়ের সবচেয়ে বড় সংকটগুলোর একটি হলো—সাফল্যের সংকীর্ণ সংজ্ঞা। আমরা এমন এক সমাজে বাস করছি, যেখানে মানুষের মূল্য অনেক সময় নির্ধারিত হয় একটি ফলাফল, একটি প্রতিষ্ঠান, একটি পদবি বা একটি সামাজিক স্বীকৃতির মাধ্যমে। অথচ মানুষের ভেতরের জগৎ, তার আত্মসম্মান, তার ঈমান, তার মানসিক সুস্থতা—এসবই থেকে যায় অদৃশ্য। এই বই সেই অদৃশ্য জগতের কথা বলে।

এটি কেবল হতাশা বা ব্যর্থতার কাহিনি নয়; এটি আত্মপরিচয়ের সন্ধান, ভেঙে পড়া বিশ্বাসকে পুনর্গঠন, এবং সৃষ্টির ভেতর থেকে স্রষ্টার দিকে ফিরে যাওয়ার এক অন্তর্মুখী যাত্রা। এখানে আমরা দেখি—মানুষ যখন বাহ্যিক সাফল্যের ওপর নিজের অস্তিত্ব গড়ে তোলে, তখন একটি ধাক্কাই তাকে শূন্যতার মুখে ঠেলে দিতে পারে। আবার সেই মানুষই যখন নিজের ভেতরের কেন্দ্রে ফিরে আসে, তখন অন্ধকারের মধ্যেও নতুন আলোর সম্ভাবনা খুঁজে পায়।

বইটির একটি বড় শক্তি হলো—এটি গড়পরতা চঙে কেবল উপদেশ দেয় না, বরং ভাবতে শেখায়। এটি প্রশ্ন তোলে—আমি কে? আমার মূল্য কী দিয়ে নির্ধারিত? ব্যর্থতাই কি জীবনের শেষ কথা? নাকি সেটি নতুন শুরুর দরজা? লেখক মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং জীবনের ব্যবহারিক শিক্ষা—এই তিনকে একসূত্রে গেঁথে এমন এক ভাষা নির্মাণ করেছেন, যা একই সঙ্গে হৃদয়গ্রাহী ও চিন্তাশীল।

বিশেষভাবে লক্ষণীয়, বইটি তরুণ প্রজন্মের মানসিক সংগ্রামকে অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে তুলে ধরেছে। তুলনা, প্রত্যাশা, সামাজিক চাপ, আত্মঅবমূল্যায়ন—এসবের সঙ্গে আজকের যুবসমাজ প্রতিনিয়ত লড়াই

১০ ♦ টানেলের ওপারে

করছে। একই সঙ্গে এটি অভিভাবকদের জন্যও এক গুরুত্বপূর্ণ আয়না, যেখানে তারা নিজেদের অজান্তে চাপিয়ে দেওয়া স্বপ্নগুলোর প্রতিফলন দেখতে পারবেন।

একজন প্রকাশক হিসেবে আমাদের বিশ্বাস, সাহিত্যের কাজ কেবল গল্প বলা নয়; বরং মানুষকে নিজের ভেতরে ফিরিয়ে নেওয়া। এই বই সেই কাজটিই করেছে—পাঠককে থামতে বাধ্য করে, ভাবতে শেখায়, এবং মনে করিয়ে দেয় যে মানুষের আসল শক্তি তার ভেতরের দৃঢ়তা ও ঈমানের জায়গায়।

আমরা আশা করি, এই গ্রন্থ অনেকের হৃদয়ে নতুন করে আশার স্ফুলিঙ্গ জ্বালাবে। কোনো কঠিন সন্ধ্যায়, যখন মনে হবে সব দরজা বন্ধ—তখন হয়তো এই বইয়ের কোনো একটি ভাবনা পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেবে: পথ শেষ হয়নি, কেবল দিক বদলেছে। সেই প্রত্যাশা নিয়েই আমরা বইটি পাঠকের হাতে তুলে দিচ্ছি।

বিনীত,

আজমিন আক্তার ইভা

পবা, রাজশাহী

info.iffah@gmail.com

১৬-০২-২০২৬



লেখিকার কথা

জীবনের কোনো এক পর্যায়ে আমরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনোভাবে আটকে যাই—ভাবনায়, অনুভূতিতে, সম্পর্কে, কিংবা নিজের কাছেই। অনেক সময় সেই আটকে থাকার নামটুকুও আমরা জানি না।

আমি জানি, এমন কিছু কষ্ট আছে যেগুলো কাউকে বলা যায় না। বললেও পুরোটা বলা হয় না। প্রতিদিনের হাসি, দায়িত্ব আর মানিয়ে নেওয়ার আড়ালে আমরা অনেক কথা চেপে রাখি। কখনো অন্যের পূর্ণতা দেখে অজান্তেই নিজের সাথে তুলনা চলে আসে, কখনো বুকফাটা কান্না জমে থাকে অথচ প্রকাশ পায় না, কখনো জীবনের অজানা অপরাধবোধ আমাদের নিঃশব্দে গ্রাস করে ফেলে।

এই বই সেই চেপে রাখা অনুভূতিগুলোরই একটি ভাষা দেওয়ার ছোট্ট চেষ্টা মাত্র।

আমি চেয়েছি চাপা পড়ে থাকা অনুভূতিগুলোকে স্বীকৃতি দিতে—যেন কেউ এক মুহূর্তের জন্য হলেও মনে করতে পারে, “আমি একা নই।” যদি এই লেখার কোনো একটি লাইন আপনাকে থামিয়ে দেয়, যদি কোথাও নিজের ছায়া দেখতে পান, তাহলেই আমার লেখা সার্থক।

আমি বিশ্বাস করি, সব অন্ধকারের শেষে আলো সব সময় দেখা যায় না। কিন্তু আলো যে কোথাও আছে, এই বিশ্বাসটাই মানুষকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। অনেক সময় আমরা আলোটা চোখে দেখি না, শুধু অনুভব করি। তবু সেই অনুভবই আমাদের টানেলের ভেতর দিয়ে হাঁটতে সাহস দেয়।

এই লেখার প্রতিটি লাইনে আমি সেই বিশ্বাসটাই ধরে রাখতে চেয়েছি—যে

১২ ♦ টানেলের ওপারে

বিশ্বাস বলে, টানেলের ওপারে আলো আছে। হয়তো এখনই দেখা যাচ্ছে না, হয়তো পথটা লম্বা, কিন্তু আলো আছে।

জীবন আমাদের সবাইকে একই জায়গায় দাঁড় করায় না, কিন্তু নিজেকে বোঝার সুযোগ করে দেয়। সব প্রশ্নের উত্তর এখনই পাওয়া জরুরি নয়, সব অন্ধকারও এখনই দূর হওয়া দরকার নেই। কখনো কখনো কেবল এটুকু বিশ্বাসই যথেষ্ট—“আমি চেষ্টা করছি, আমি থামিনি।”

যদি আজ এই লেখার কোনো একটি কথা আপনাকে নিজের দিকে একটু ফিরে তাকাতে শেখায়, নিজের কণ্ঠকে ছোট না করে সম্মান করতে শেখায়, তাহলেই এই লেখার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। কারণ নিজের ভেতরের সত্যকে চিনতে পারাই সবচেয়ে বড় শিক্ষা।

জীবনে চলার পথে হাঁটতে হাঁটতে থেমে গেলে দোষ নেই। থেমে যাওয়া মানে হার মানা নয়। নিজের পথকে অন্যের সঙ্গে তুলনা করারও কোনো প্রয়োজন নেই—কারণ প্রত্যেকের যাত্রা আলাদা, প্রত্যেকের গতি আলাদা।

শুধু এই বিশ্বাসটা ধরে রাখুন—টানেলের ওপারে আলো আছে। ধীরে ধীরে, নিজের গতিতে, আপনি ঠিকই সেখানে পৌঁছাবেন।



সম্পাদকের কথা

বর্তমান সময়ের তরুণ প্রজন্ম এক ভয়াবহ একাকিত্ব ও তীব্র প্রতিযোগিতার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। সমাজ ও পরিবারের বেঁধে দেওয়া সফলতার সংজ্ঞার সঙ্গে তারা যখন নিজেদের মেলাতে না পারে, তখন ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়ে, গুটিয়ে যায় নীরবে। এই বইয়ের গল্প তাই কেবল ‘হামজা’ নামের এক যুবকের নয়, এটি আমাদের চারপাশের অসংখ্য তরুণের না-বলা কথা ও প্রশ্নের উত্তর। এক অর্থে, এটি আমাদের সময়েরই একটি সং প্রতিচ্ছবি।

পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে আমি যখন কাজ করতে গিয়েছি, তখন একটি বিশেষ উপলব্ধি হয়েছে—এটি নিছক গল্পগ্রন্থ নয়। প্রচলিত ছোটগল্পের কাঠামোকে অতিক্রম করে এটি হয়ে উঠেছে জীবনমুখী ও অনুপ্রেরণাধর্মী এক রচনা। গল্পের প্রবাহ বজায় রেখেই লেখক অত্যন্ত সাবলীলভাবে জীবনের কঠিন বাঁকগুলো তুলে ধরেছেন এবং শুধু সমস্যার চিত্র আঁকেননি, বরং সেখান থেকে বেরিয়ে আসার বাস্তবসম্মত পথও দেখিয়েছেন।

একজন সম্পাদক হিসেবে পাণ্ডুলিপিটি সম্পাদনার সময় বহু জায়গায় আমাকে থমকে দাঁড়াতে হয়েছে। কিছু কিছু দৃশ্য ও সংলাপ এতটাই জীবন্ত যে, নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছি। সত্যি বলতে, এই বইয়ের ওপর কাজ করা আমার জন্য কেবল পেশাগত দায়িত্ব ছিল না, এটি ছিল ব্যক্তিগত ভাবনাজগতে নাড়া দেওয়ার একটি মাধ্যম।

১৪ ♦ টানেলের ওপারে

পরিশেষে বলব, এই বইটি কেবল পড়ার জন্য নয়, অনুভব করার জন্য। এটি এক যাত্রা—অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, সংশয় থেকে দৃঢ় বিশ্বাসের দিকে।

এমন একটি অর্থবহ বইয়ের সাথে যুক্ত থাকতে পেরে আমি আনন্দিত। আশা করি, ‘টানেলের ওপারে’ প্রতিটি পাঠকের মনে নতুন ভোরের আশা জাগিয়ে তুলবে ইনশাআল্লাহ।

ফাতেমা জাহান জুনাইরাহ

মেইল: [window.fatema@gmail.com](mailto>window.fatema@gmail.com)



টানেলের ওপারে

হামজার স্থির দৃষ্টি রেজাল্ট পোর্টালের দিকে। কম্পিউটার স্ক্রিনের তীব্র সাদা আলো তার ক্লান্ত মুখে আছড়ে পড়েছে; মনে হচ্ছে সেই আলো তার ভেতরের সমস্ত প্রাণশক্তি শুষে নিয়ে এক অদ্ভুত নীলচে ফ্যাকাশে ছাপ রেখে গিয়েছে। চোখের নিচে গভীর কালচে দাগগুলো গত কয়েক রাতের নিঃশুম প্রহর কাটানোর স্পষ্ট সাক্ষী।

তার শুকনো ঠোঁট দুটো বারবার কাঁপছে, কিন্তু কোনো শব্দ নেই, ঘরময় কেবল ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ। এই থমথমে বিষণ্ণ নীরবতার মাঝে থেকে থেকেই মাউসের একঘেয়ে ক্লিকের শব্দ আসছে কানে। প্রতিটি ক্লিক তার বুকের ভেতর দুরূহ কাঁপন আর এক আতঙ্কের প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসছে।

ক্লিক... লোডিং... আবার ক্লিক।

মুহূর্তেই স্ক্রিনে ভেসে উঠেছে নাম ও রোল নং এর এক দীর্ঘ তালিকা। হামজার চোখগুলো বুভুক্ষুর মতো একবার উপর থেকে নিচে, আবার নিচ থেকে উপরে হন্যে হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। মাউসের ওপর রাখা তর্জনীটা থরথর করে কাঁপছে; প্রতিটি ক্লিকের আগে-পরে সে নিজের ভেতরের চরম অস্থিরতাকে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।

ঘরের ভেতরের নিস্তর্রতা এখন এতটাই জমাট বেঁধেছে যে, নিজের অগোছালো নিঃশ্বাসের শব্দও তার কানে এসে ধাক্কা দিচ্ছে, মনে হচ্ছে বুকের ভেতর কোনো হাপর চলছে। মাথার ওপরে ফ্যান ঘুরছে ঠিকই, কিন্তু দুঃশ্চিন্তার প্রচণ্ড চাপে তার কপালে জমে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে স্ক্রিনের তালিকা, আর অস্থির হাতে

বারবার উপর-নিচ ফ্রল করছে। তার চাহনি এতটাই একাগ্র যে, নিজের রোলটা দেখামাত্রই শিকারি ঈগলের মতো ছোঁ মেরে তুলে নেবে। কিন্তু সেই একাগ্র দৃষ্টি বারবার ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসছে; মিলছে না কাঙ্ক্ষিত রোলের দেখা।

হঠাৎ করেই খাঁ খাঁ করে উঠল হামজার বুকের ভেতরটা। মনে হলো, শরীর থেকে কেউ একজন মাত্রই সবটুকু প্রাণবায়ু শুষে নিয়েছে। সে শুকনো গলায় একবার ঢোক গিলে আবার রিফ্রেশ করল। একবার, দুবার, তিনবার— সে পাগলের মতো রিফ্রেশ করতে লাগল; যেন বারবার চেষ্টা করলেই অলৌকিকভাবে নামটা ফ্রিনে ভেসে উঠবে।

কিন্তু প্রতিটি রিফ্রেশ তাকে আরও গভীর হতাশার সাগরে ডুবিয়ে দিল। একসময় তার শূন্য চোখ দুটো নিপ্রাণ হয়ে স্থির হয়ে এল। কাঁপা চোঁট জোড়া কিছু বলতে চাইল, কিন্তু কোনো শব্দ ফুটল না। দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন, পাহাড়সম প্রত্যাশা আর তিল তিল করে জমানো আত্মবিশ্বাস মুহূর্তেই তাসের ঘরের মতো ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

—“এটা কী করে সম্ভব?” নিজের অবচেতন মনের কাছেই প্রশ্নটি ছুঁড়ে দিল হামজা।

যে ছেলোটি সারা জীবন ক্লাসে প্রথম হওয়ার রেকর্ড ধরে রেখেছে, পরীক্ষার আগের রাতেও যে হাসিমুখে বন্ধুদের নোট বুঝিয়ে দিয়েছে, শিক্ষকরা যার মেধার প্রশংসায় সবসময় পঞ্চমুখ ছিল, আজ সেই ছেলের নামটাই কি না বুয়েট ভর্তি পরীক্ষার তালিকায় নেই! পুরো ব্যাপারটাই তার কাছে চরম অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে।

হামজার হঠাৎ মনে হলো, পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে আর তার চেনা পৃথিবীটা ভনভন করে ঘুরতে শুরু করেছে। দেয়ালের ওই বর্গাকৃতির ঘড়িটার টিকটিক শব্দ এখন তীব্র হয়ে কানে বাজছে। দূরে কোথাও কেউ একজন একটানা গাড়ির হর্ন বাজিয়ে চলেছে। কিন্তু এই কোলাহলের মাঝেও সব শব্দ তার কাছে কেন যেন দীর্ঘগতির হয়ে আসছে। তার মনে হতে লাগল, হয়তো আর কিছুক্ষণ পর এই ঘূর্ণমান পৃথিবীটাও ক্লান্ত হয়ে থমকে যাবে।

:রেজাল্ট নিয়ে চিন্তা কোরো না, আগামী সপ্তাহ থেকে তুমি একজন বুয়েটিয়ান। এটাই তোমার পরিচয়।

শুয়ে শুয়ে গতকাল বাবার বলা কথাগুলো মনে করার চেষ্টা করল হামজা। কতটা দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বাবা কথাগুলো বলেছিলেন! সে চোখ বন্ধ করতেই কথাগুলো তার কানে প্রতিধ্বনির মতো বাজতে লাগল।

বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান হামজা। শৈশব থেকেই তার নামের সাথে একটি অলিখিত উপাধি জুড়ে দেওয়া হয়েছিল—‘বুয়েটিয়ান’। বাবা সবসময় বুক ফুলিয়ে গর্ব করে বলতেন, “আমার ছেলে একদিন বুয়েটে পড়বে, দেশের সেরা ইঞ্জিনিয়ার হবে।” বছরের পর বছর ধরে সেই একটি পরিচয়ই ছিল তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তার সমস্ত সত্ত্বা আর আকাঙ্ক্ষা আবর্তিত হতো ওই একটিমাত্র শব্দকে ঘিরে।

গতকাল পর্যন্ত সেই রঙিন স্বপ্নেই বিভোর ছিল সে। চোখ বন্ধ করলেই চোখের পাতায় ভেসে উঠত বুয়েট ক্যাম্পাসের প্রথম করিডর, প্রিয়জনদের প্রশংসা আর গর্বে উদ্ভাসিত বাবা-মায়ের মুখ। সেই স্বপ্নের আভা তার প্রতিটি পদক্ষেপে জড়িয়ে থাকত।

আর আজ?

ভবিষ্যতের সেই উজ্জ্বল কল্পনাগুলো এখন তাকে এক অন্ধকার সুড়ঙ্গের মতো গিলে খাচ্ছে। সামনে কোনো আলো নেই, আছে শুধু অন্তহীন আঁধার। তার পুরো পৃথিবীটা এখন একটি নিষ্ঠুর সত্যে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে— “আমি ব্যর্থ।”

এই মুহূর্তের লজ্জা, সামাজিক চাপ আর বুক চিরে আসা তীব্র যন্ত্রণা তার অস্তিত্বকে গ্রাস করে নিয়েছে। তার পুরো দুনিয়াটা ঢাকা পড়ে গিয়েছে এক বিশাল বিষণ্ণ ছায়ায়। বুকের গভীর থেকে কিছু অব্যক্ত কণ্ঠস্বর ফিসফাস করে বলছে—

“তুই সবার থেকে পিছিয়ে পড়েছিস।”

“তুই নিজের সময়গুলো নষ্ট করেছিস।”

“তুই এখানেই আটকে যাবি।”

দুহাতে নিজের কান চেপে ধরল হামজা। চোখ দুটো সজোরে বন্ধ করল যেন বাইরের জগতের মতো ভেতরের এই শব্দগুলোকেও সে ঠেকিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু না, ওরা থামল না। বরং প্রবল বিক্রমে তার মস্তিষ্কের দেয়ালে হাতুড়ি পেটাতে লাগল। সমস্ত দ্বিধা আর গ্লানি ছাপিয়ে একটি প্রশ্নই এখন তার মস্তিষ্কে বিষাক্ত সাপের মতো ঘুরপাক খাচ্ছে—

“আমি এখন মুখ দেখাবো কীভাবে?”

ঘরের পর্দাগুলো শক্ত করে টানা। বাইরে সূর্যের আলো ঝলমল করলেও ভেতরে তার প্রবেশাধিকার নেই। পুরো ঘরটা এক ধরনের কৃত্রিম আবছা অন্ধকারে ছেয়ে আছে। দেয়াল ঘড়ি নিয়ম মেনে টিকটিক করে চলছে ঠিকই, কিন্তু হামজার কাছে সময় যেন বরফের মতো জমে স্থির হয়ে গিয়েছে। সে বিছানার এক কোণে হাটুগুলো বুকের কাছে গুটিয়ে শুয়ে আছে। দেহটা একদম নিস্তেজ। চোখ দুটো যান্ত্রিকভাবে পলক ফেলছে, পাপড়িগুলো শুকিয়ে যাওয়া লোনা অশ্রুতে একটি আরেকটির সাথে লেগে আছে। তার ঠোঁট জোড়া সামান্য ফাঁকা, যেখান দিয়ে ধীরলয়ে বের হচ্ছে ক্লান্তিভরা তপ্ত নিঃশ্বাস। অদূরেই অপ্রয়োজনীয় কালো বাক্সের মতো দুদিন ধরে পড়ে আছে ফোন। তাতে অ্যারোপ্লেন মোড চালু করা। হামজা ইচ্ছা করেই এটা চালু রেখেছে। ফোনের ওই অন্ধকার স্ক্রিনটাই এখন তার কাছে সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়। কারণ সে জানে, এই অন্ধকার কাটলেই খেয়ে আসবে একটাই প্রশ্ন— “রেজাল্ট কী?”

সে জানে, কেউ জানতে চাইবে না তার বুকের ভেতর কী ঝড় বইছে; কেউ পরম মমতায় জিজ্ঞেস করবেনা— ‘হামজা, তুই কেমন আছিস?’ সবার একটাই কৌতূহল—সে কি চাপ পেয়েছে?

হামজার কল্পনায় ভেসে উঠল পরিচিত মুখগুলো, কারও চোখের করুণার চাহনি, কারও গলায় মিছে সহানুভূতির সুর। সে যেন আগেই শুনতে পাচ্ছে

সেই শব্দগুলো যা তার বুকের ভেতরটা আরও ভারী করে তুলবে। এসব ভাবতে ভাবতে, তার চোঁট জোড়া শক্ত হয়ে এল, রাগ আর অভিমানে ফুলে উঠল কপালের শিরা। প্রতিটি সম্ভাব্য কলের কথা চিন্তা করতেই বুকের ভেতর ড্রামের মতো ধুকপুকানি শুরু হলো।

পৃথিবীর এই নিষ্ঠুর রুঢ়তা সহ্য করার মতো মানসিক শক্তি এই মুহূর্তে হামজার নেই। তাই নিজেকে আড়াল করতে সে ফোনটা দূরে সরিয়ে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। নিজের চারপাশজুড়ে তুলে দিল এক অদৃশ্য দেয়াল। এই দুর্ভেদ্য দেয়াল টপকে তার কাছে পৌঁছানোর সাধ্য নেই কারও। বালিশে মুখ গুঁজে সে নিজের কান্না আর কণ্ঠস্বরকে দমিয়ে রাখল। তার বুকের ভেতর অবিরত বয়ে চলল স্বপ্ন ভাঙার এক মরণপণ হাহাকার।

হামজার রুমের পাশেই রান্নাঘর। সেখান থেকে ভেসে আসছে মায়ের নড়াচড়ার আওয়াজ। বাসনপত্র মাজার শব্দ, হাঁড়িপাতিলের ঠুকাঠুকি, ধোঁয়া ওঠা গরম ভাতের মোহনীয় স্রাণ তার কাছে এখন অর্থহীন। তীব্র কষ্টে সে ক্ষুধার অস্তিত্বই ভুলে গিয়েছে। তার ছোট দুনিয়াটা এখন সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে মাত্র তিনটে জিনিসে। একটা ঘর, একটা বিছানা, আর মাথার ভেতর নিরন্তর ঘুরতে থাকা একটা প্রশ্ন, “এখন আমার জীবন দিয়ে কী হবে?”

বাবা-মায়ের মৌন শাসন তার কাঁধের বোঝাটা আরও ভারী করে তুলেছে। তাদের সামনে গেলেই বুকে ভর করে এক অদৃশ্য চাপ। কথাহীন দৃষ্টি, নিঃশব্দ প্রত্যাশা তার ভাঙা অন্তরকে আরও বিচূর্ণ করে দিচ্ছে। সে কারও সামনে যাচ্ছে না, কারও চোখের সাথে চোখ মেলাচ্ছে না। সে চায় না কেউ তার চোখের গভীরে লুকানো কষ্টটুকু পড়ে ফেলুক; কেউ বুঝে ফেলুক তার ধ্বংস হয়ে যাওয়া অন্তরের খবর।

তৃতীয় দিনের অলস সকাল।

ঘরের পর্দা ভেদ করে আলো ঢুকতে না পারায় রুমটা এখনো সেই আবহাওয়ায় অন্ধকারে গুমোট হয়ে আছে। দেয়াল ঘড়িটার টিকটিক শব্দ আজ বড্ড বিরক্তিকর ঠেকছে হামজার কাছে। তার কেবলই মনে হচ্ছে, সে বুঝি এখনই

কোনো এক গভীর, অন্ধকার গহ্বরে তলিয়ে যাবে।

বিছানার এক কোণে ফোনটা আগের মতোই অবহেলায় পড়ে ছিল। হামজা একবার সেদিকে হাত বাড়িয়েও আবার গুটিয়ে নিল। কয়েক মুহূর্তের দ্বিধা কাটিয়ে শেষমেশ ফোনটা হাতে নিল; আনমনেই চালু করল ওয়াইফাই। পাঁচ সেকেন্ডের নিস্তব্ধতা ভেঙে ফোনের স্ক্রিনটা ফেটে পড়ল আলোর বন্যায়।

হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার আর ইনবক্সে নোটিফিকেশনের ঝড়। প্রতিটি বার্তা চিৎকার করে হামজাকে জিঞ্জিৎস করছে—

“তুই কোথায়?”

“রেজাল্ট কী হলো?”

“ফোন বন্ধ কেন?”

হামজা নির্লিপ্তভাবে স্ক্রল করে গেল, কিন্তু কোনো উত্তর দিল না। প্রতিটি মেসেজ তার মস্তিষ্কে কুয়াশার মতো চেপে বসছে; কারোর কোনো প্রশ্নের জবাব দেওয়ার মতো শক্তি বা ইচ্ছা, কোনোটাই এখন তার অবশিষ্ট নেই।

হঠাৎ একটি মেসেজে হামজার চোখ আটকে গেল।

“আমি জানি তুই এখন কথা বলার মতো অবস্থায় নেই। কিন্তু যখনই প্রয়োজন মনে করবি, আমি আছি।”

মেসেজটি আদিল ভাইয়ের। মনে হলো, ফোনের নিষ্প্রাণ স্ক্রিন ভেদ করে এক ফালি নরম আলো তার বুকের ভেতর ঢুকে পড়েছে। হামজা স্থির চোখে স্ক্রিনটার দিকে চেয়ে রইল। তার আঙুল থেমে গেল, বুকের ভেতর এক নিঃশব্দ কাঁপন বয়ে গেল আর চোখের কোণে জমে উঠল একরাশ আর্দ্রতা। সে কোনো প্রতিউত্তর করল না ঠিকই, কিন্তু তার মনে হলো দমবন্ধ হওয়া ভারী নিঃশ্বাসটা এখন একটু হালকা হয়ে এসেছে, জমাট বাঁধা কষ্টের বরফটা গলতে শুরু করেছে। স্বস্তি পেল এই ভেবে, অন্তত কেউ একজন তো আছে, যে তার নিরবতার ভাষাটা বুঝতে পেরেছে।

আদিল হামজার ফুফাতো ভাই। কিন্তু রক্তের সম্পর্কের ঊর্ধ্বে আদিল ভাই তার কাছে পরম আশ্রয়ের নাম। মানুষটার চোখেমুখে সবসময় এক অদ্ভুত প্রশান্তি খেলা করে, মনে হয় তার অন্তরের গভীরে কোথাও একটি প্রশান্ত মহাসাগর রয়েছে। অসামান্য বুদ্ধিমত্তা আর সংবেদনশীলতা তাকে অন্যদের চেয়ে আলাদা করে তুলেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাইকোলজিতে পড়াশোনা শেষ করে সে সম্প্রতি কানাডার এক নামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সেকেন্ড মাস্টার্সের সুযোগ পেয়েছে। তবে শুধু ডিগ্রি বা একাডেমিক অর্জনই তার বড় পরিচয় নয়, মানুষের মনের গহীনে লুকিয়ে থাকা গোপন দুঃখগুলো অনায়াসে পড়ে ফেলার ক্ষমতা, জাদুকরী বাচনভঙ্গি আর অন্যের না বলা কথাগুলো গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনার গুণেই সে সবার প্রিয়। পরিবারের যেকোনো সংকটে আদিল সবার আগে এগিয়ে আসে। তাই তার পাঠানো মাত্র ক’টি উষ্ণ শব্দ আজ হামজার কাছে এক বিশাল বড় সান্ত্বনা হয়ে দেখা দিল।

শুক্রবার দুপুর। কিছুক্ষণ আগেই মা এসে ঘরের ভারী পর্দাগুলো সরিয়ে দিয়ে গিয়েছে। জানালার গরাদ ভেদ করে আসা সূর্যের সোনালি আলো বিছানার ওপর এক মায়াবী আলোছায়ার আল্পনা তৈরি করেছে। বাতাসে ভেসে থাকা ধূলিকণাগুলো রোদের স্পর্শ পেয়ে যেন আনন্দে নেচে উঠেছে। হামজা উঠে বসে নির্বাক চোখে একবার সেদিকে তাকালো। তার মনে হলো, ওই ক্ষুদ্র কণাগুলো এই নিস্তরঙ্গতার মাঝেও আলোর সাথে নিজস্ব কোনো সংকেতে কথা বলছে।

হামজার শরীর এখনো ভারী, অবসাদে কাঁধ দুটো নুইয়ে আছে। তবুও বুকের গভীরে আজ কোনো এক অচেনা তাগিদ। কিছুক্ষণ জানালার বাইরে তাকিয়ে থেকে একটি দীর্ঘশ্বাস নিল সে, তারপর সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে সোজা গোসলখানায় ঢুকে পড়ল। ঠান্ডা পানির স্পর্শ শরীরে হালকা কাঁপুনি দিয়ে তার ভেতরের জমে থাকা গ্লানিগুলোকে ধুয়ে দিতে লাগল। মনে হলো, স্বচ্ছ পানির প্রতিটি ফোঁটা তাকে কানে কানে নতুন করে বাঁচার ডাক দিচ্ছে।

গোসল শেষ করে আলমারির এক কোণে পড়ে থাকা সাদা পাঞ্জাবিটা বের

করল। ভাজ খুলতেই ন্যাপথালিন সেই পরিচিত ঘ্রাণ নাকে এল। পাঞ্জাবিটা গায়ে জড়িয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াতেই নিজের প্রতিবিশ্ব দেখে আঁতকে উঠল হামজা। চোখের নিচে ঘন ক্লান্তির কালিমা, শুষ্ক ফেটে যাওয়া ঠোঁট আর দুচোখ জুড়ে এক অতল শূন্যতা।

—“আর কতদিন?” আয়নার ওপার থেকে তার প্রতিবিশ্বই যেন এই কঠিন প্রশ্নটি ছুঁড়ে দিল। হামজা কয়েক সেকেন্ড স্থির হয়ে নিজেকে দেখল। তারপর হাত দিয়ে পাঞ্জাবির ভাঁজগুলো মসৃণ করতে করতে গভীর এক শ্বাস নিয়ে দরজার দিকে এগুলো। মনের গহীন থেকে এক চাপা কণ্ঠস্বর ফিসফাস করে বলে উঠল, “চল, নিজেকে আবার একটু গুছিয়ে নেওয়া যাক।”

অনেকদিন পর নামাজ শেষে মসজিদের প্রাঙ্গণে পা রাখল হামজা। কিছুক্ষণ আগেই মুয়াজ্জিনের গুরুগম্ভীর অথচ সুললিত আজান পুরো পরিবেশকে মোহনীয় করে তুলেছিল। এখন রাস্তার মোড়ে আর মসজিদের আঙিনায় টুপি ও শুভ্র পোশাকে পরিচিত সব মুখ। তাদের মৃদু গুঞ্জন আর ধীর পদধ্বনিতে পুরো চত্বরে এক আধ্যাত্মিক আবহ বিরাজ করছে। সবাই বাড়ির দিকে যাচ্ছে।

হামজা মসজিদ আঙিনায় দাঁড়িয়ে রইল। দুপুরের রোদ তার মুখে আছড়ে পড়ছে। তপ্ত রোদে শরীর কিছুটা ঘামলেও তিন দিনের রুমবন্দি জীবনের পর আজকের এই মুক্তি তার বুকের ভার অনেকটা কমিয়ে দিয়েছে। আঙিনা পেরিয়ে রাস্তার মোড়ে এসে সে একটি রিকশা নিল।

গন্তব্য—আদিল ভাইয়ের মেস।

—“এসেছিস!” দরজা খুলতেই সামনে আদিল ভাইয়ের সেই চিরচেনা হাস্যোজ্জ্বল মুখ। দেখা মাত্রই সে হামজাকে পরম মমতায় বুকে টেনে নিল। তারপর এক মুহূর্ত সময় না দিয়ে উষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, “আগে বল, কী খাবি? কী অর্ডার দেব?”

হামজা গম্ভীর মুখে ঘরের ভেতরে ঢুকল। দীর্ঘক্ষণ রিকশায় বসে থাকায় পাঞ্জাবির পেছনের দিকটা এলোমেলো ভাঁজ হয়ে গিয়েছে, পথের বাতাসে চুলগুলোও বড্ড অগোছালো। সে আঙুল দিয়ে কোনোমতে চুলগুলো ঠিক

করার চেষ্টা করল। তার চোখ দুটো এখনো লালচে, ক্লান্তি আর নির্ধুমতায় চোখের পাতাগুলো বুজে আসছে।

—“আমি কিছু খাওয়ার মতো মানসিক অবস্থায় নেই, ভাই।” হামজা অত্যন্ত নিচু স্বরে জবাব দিল।

আদিল মৃদু হেসে মাথা নাড়ল। হাতের চশমাটা আঙুল দিয়ে নাকের ওপর আরেকটু ঠেলে দিয়ে বলল, “জানি রে। কিন্তু খাবারের ওপর রাগ করে তো আর বাস্তবতা পালটানো যায় না। বল, পালটায় কি?”

—“ভাই, আমার জীবনটাই যেখানে তছনছ হয়ে গেছে, সেখানে তুমি খাবারের কথা বলছ।” অত্যধিক স্নেহ পেয়ে হামজা আদিল ভাইকে তুমি সম্বোধন করে।

আদিল ভাই আর কোনো পাল্টা যুক্তি দিল না। ধীর পায়ে এগিয়ে এসে হামজার পাশে বসল। কাঠের পুরনো চেয়ারটা একটু শব্দ করে নড়ে উঠল। ঘরের ভেতরটা আবার এক গভীর নীরবতায় ডুবে গেল।

হামজা চুপ। তার নিঃশ্বাস ভারী। সে হাতের ওপর হাত রেখে মাটির দিকে তাকিয়ে আছে। এই অসহ্য গুমোট নিস্তর্রতা ভেঙে আদিল ভাই কথা শুরু করল। তার স্বর খুব শান্ত অথচ গভীর।

“পরিবার বা সমাজ থেকে আমাদের ওপর যখন এক পাহাড় সমান প্রত্যাশা চাপিয়ে দেওয়া হয়, তখন একটা অদৃশ্য মানসিক চাপ মস্তিষ্কে চেপে বসে। আমরা যদি সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে ব্যর্থ হই, তাহলে মানসিকভাবে পঙ্গু হয়ে যাই। তখন জীবনের বিস্তৃত দিকগুলো আর চোখে পড়ে না; সামনের ছোট ছোট সমস্যাগুলোই তখন পাহাড়ের মতো বিশাল মনে হয়।”

হামজা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। তার দৃষ্টি এখনো মেঝের দিকে নিবদ্ধ।

—“ঠিক তাই ভাই। এখন আমার নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যর্থ মানুষ মনে হচ্ছে।” হামজার কণ্ঠটা একদম নরম শোনালো।

—“তোর ওপর এখন যে চাপটা কাজ করছে, সেটা শুধু এই একবার ফেল হওয়ার জন্য না রে। এটা আসলে তোর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন, আর অন্যদের

প্রত্যাশার বোঝা।” আদিল হামজার হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে আশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাল। “তুই ছোটবেলা থেকেই একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের পেছনে দৌড়াচ্ছিলি। আজ যখন সেটা হাতছাড়া হলো, তুই শুধু একটা সুযোগই হারাসনি, তুই নিজের লক্ষ্যের একটা বড় অংশও হারিয়ে ফেলেছিস। তোর মাথার ভেতর এখন এক বিশাল শূন্যতা। নিজের সম্পর্কে তোর যে ধারণা ছিল, আজ সবকিছুই ওলটপালট। কিন্তু হামজা, জীবন মানে কি শুধুই একটা স্বপ্ন? জীবন কি তার চেয়ে বড় কিছু নয়?”

হামজা কোনো জবাব দিল না, স্থির দৃষ্টিতে মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল। তবে আদিল বুঝতে পারল, ছেলেটা তার প্রতিটি কথা খুব গভীরভাবে উপলব্ধি করছে।

—“ধর, তুই একটা টানেলের ভেতর আছিস। টানেলের ভেতরে বসে সামনে তাকালে যেমন একটাই পথ দেখা যায়, তোর চোখের সামনেও তেমন শুধু একটা ব্যর্থতাটাই ঘুরছে।

তোর কাছে মনে হচ্ছে, ওই পথের বাইরে আর কিছু নেই। কিন্তু আসল ব্যাপারটা কী জানিস? টানেল থেকে বেরোলে তখন বোঝা যায়, চারপাশে আসলে আরও অনেক কিছু আছে।”

আদিল ভাই একটু থামল, তারপর আবার শান্ত স্বরে বলতে শুরু করল—

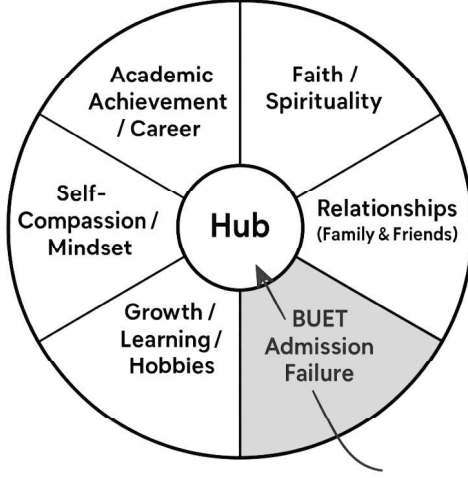
“শোন হামজা, জীবনটা কোনো টানেল নয় যে একটা পথের দিকেই তাকিয়ে থাকবি। তোর তো এর বাইরের বিশাল জগতটা দেখা এখনো বাকি।” একটা লম্বা-চওড়া ভাষণ দিল আদিল।

হামজার শরীরটা সামান্য কেঁপে উঠল। সে মেঝে থেকে দৃষ্টি সরিয়ে অন্যদিকে ফেরাল। তার পাশেই একটা ছোট টেবিল। টেবিলের ওপর অনেক বইপত্র। আদিল ভাইয়ের প্রতিটি শব্দ তার বুকের ভেতর ঢেউ তুলছে ঠিকই, কিন্তু মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোচ্ছে না।

— “দ্যাখ, তোকে একটা জিনিস দেখাই কনসেন্ট্রেন্ট কর। এটাকে কেবল সাইকোলজির তত্ত্ব বলব না,

আমি নিজেও রিয়েল লাইফে ইউজ করি।” আদিল হামজা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে খাতা-কলম হাতে নিল। একটা বৃত্ত এঁকে এর ঠিক মাঝখানে টোকা দিল।

WHEEL OF AWARENESS



—“এই জায়গাটাকে ধর। এটা গাড়ির চাকার একদম মাঝখানের অংশ। এটাকে আমরা হাব বলি। এখন তোর অবস্থান হওয়া উচিত এই হাবে। এখানে তুই স্থির, সচেতন আর নিজের জায়গায় অটল। এখানে তোর বিশ্বাস আছে, ধৈর্য আছে, আর দুঃসময়েও নিজেকে সামলে রাখার শক্তি আছে। ঠিক যেমন চাকার মাঝখানটা শক্ত থাকলে পুরো চাকাটা ঠিকঠাক ঘোরে। এই কেন্দ্রটা এমন একটা জায়গা, যেটা কোনো রেজাল্ট, কোনো ব্যর্থতা বা কারো মতামত নষ্ট করতে পারে না। এটা পুরোপুরি তোর নিজের ভেতরের জায়গা।”

হামজা একমনে কাগজের ওপর আঁকা ওই বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুটির দিকে তাকিয়ে রইল।

আদিল এবার সেই বৃত্তের চারপাশে আরও বড় একটি বৃত্ত আঁকল। তারপর বৃত্তের ভেতরে আড়াআড়ি দাগ টেনে কতগুলো আলাদা ঘর তৈরি করল।

প্রতিটি ঘরে আলতো করে কলমের মাথা ছুঁয়ে বলল—

“এই বাইরের বৃত্তটা হলো চাকার রিম। তোর পরিবার, পড়াশোনা, বন্ধু, স্বাস্থ্য, স্বপ্ন, ক্যারিয়ার এখানে থাকে। এগুলো তোর জীবনের আলাদা আলাদা অংশ। চাকার ভারসাম্য রাখতে রিমের সব অংশ যেমন দরকার, তোর জীবন ঠিক রাখতে পরিবার, পড়াশোনা আর ক্যারিয়ার—সবই দরকার। কিন্তু মনে রাখিস, এর কোনোটাই একা তোর পুরো জীবন না।”

আদিল একবার হামজার চোখের দিকে তাকাল, তারপর আবার বৃত্তের দিকে মনোযোগ দিল।

—“এই দেখ, রিমের এই ছোট ঘরটায় আছে বুয়েটের ব্যর্থতা। এখন সমস্যাটা কী জানিস? তুই হাব থেকে পুরো মনটা সরিয়ে এনে এই একটামাত্র ভাঙা ঘরেই আটকে রেখেছিস। আর তাই তোর পুরো চাকাটাই এখন ঠিকমতো ঘুরছে না।” একটা ঘরে কলম রাখল আদিল ভাই।

—“ভাই, এটাই তো আমার সবকিছু তছনছ করে দিল!” হামজা নিচু স্বরে বলল, আদিল মৃদু হাসল। সেই হাসিতে কোনো অবজ্ঞা ছিল না, ছিল না কোনো উপদেশের গুরুভার; বরং সেখানে মিশে ছিল একজন প্রিয় মানুষের গভীর মমত্ব আর আশ্বাস।

—“না রে, তোর সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি। তুই কেবল এক জায়গায় থমকে গেছিস। তোর পুরো মনোযোগ এখন একটা ক্ষণস্থায়ী মুহূর্ত আর ছোট একটা বিন্দুতে আটকে আছে।” আদিল ভাই এবার একটু সামনের দিকে ঝুঁকে বসল।

“তুই জানিস? আমরা যখন অতিরিক্ত মানসিক চাপে থাকি, তখন আমাদের মস্তিষ্ক ঠিক একটা ক্যামেরার মতো আচরণ করে। সে কোনো একটা নির্দিষ্ট দৃশ্যকে এত বেশি জুম-ইন করে ফেলে যে, চারপাশের বাকি সবকিছু অদৃশ্য হয়ে যায়। এই অবস্থায় মস্তিষ্কের আবেগপ্রবণ অংশটা আমাদের যুক্তিবাদী অংশকে পুরোপুরি কন্ডা করে ফেলে। ফলে আমরা দীর্ঘমেয়াদী কোনো কিছু চিন্তা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলি।”

পরিবেশটা একটু হালকা করার জন্য আদিল আবারও মৃদু হাসল। হামজাকে তার জীবনের মূল কেন্দ্রে ফিরিয়ে আনতে তাকে আরও অনেক কিছু বোঝাতে হবে। সে আবার বলতে শুরু করল—

“তুই এখন জীবনের চাকার ওই রিমের একটি অংশে আটকে আছিস। কিন্তু যদি একবার নিজে থেকে ওই হাবে ফিরিয়ে আনতে পারিস, তবেই দেখবি জীবনের বাকি উজ্জ্বল দিকগুলোও তোর চোখে পড়ছে।”

হামজা কিছু বলল না, তবে তার চোখের তারায় এক চিলতে অদৃশ্য আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল। আদিল ভাই এবার সরাসরি হামজার চোখের দিকে তাকালো, “শোন হামজা, এই মুহূর্তে তোর মনে হচ্ছে তুই তলিয়ে যাচ্ছিস। চারদিক থেকে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। সামনে কোনো পথ নেই, চারপাশে শুধু অন্ধকার।

কিন্তু জানিস, মুসা (আ.) এর জীবনেও ঠিক এমন একটা মুহূর্ত এসেছিল?”

—“মানে?” হামজা কৌতূহলী হয়ে ঞ্চ কুঁচকাল।

—“বনী ইসরাইলকে নিয়ে মুসা (আ.) দাঁড়িয়ে আছেন লোহিত সাগরের তীরে। পেছনে ফিরাউনের বিশাল আর হিংস্র সেনাবাহিনী। সামনে উত্তাল সমুদ্র, আর পেছনে নিশ্চিত মৃত্যু।

পালানোর কোনো পথ নেই, বাঁচার কোনো উপায় নেই। তখন তাঁর সঙ্গীরা ভয়ে চিৎকার করে বলে উঠল,

‘আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম!’ তাদের দৃষ্টি টানেলের শেষ প্রান্তের মতো একটা দিকে আটকে গেল।” আদিল ভাই গল্প বলায় পটু; সে এমনভাবে কথাগুলো বলছে যে প্রতিটি ঘটনা হামজার চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠছে।

—“তারপর কী হলো?” হামজা উৎসুক হয়ে উঠল। পরের ঘটনা শোনার জন্য তার ভেতরটা ছটফট করছে।

—“কিন্তু মুসা (আ.) দমে যাননি। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বললেন—